বি প্যারেন্টস

শিশু মনোবিজ্ঞানী
ডা. সুলতানা রাজিয়া

তওহীদ প্রকাশন

বি প্যারেন্টস

লেখক : শিশু মনোবিজ্ঞানী ডা. সুলতানা রাজিয়া

প্রচ্ছদ : হেলাল উদ্দিন ও মো. ইমন হাসান দুর্জয়

লে-আউট কম্পোজিশন : ওবায়দুল হক বাদল

প্রুফ রিডিং : আজিমুল হক

মূল্য : ১৮০ টাকা

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায় :

তওহীদ প্রকাশন

১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

tawheedprocation@gmail.com

তওহীদ প্রকাশন

উৎসর্গ

গুড প্যারেন্টিং এ আগ্রহী অভিভাবকদের

সূচিপত্র

চেম্বারে ক্ষণিক দেখা আমার অভিজ্ঞতা ৯
একটি প্রতিবন্ধী শিশুর ইচ্ছের গল্প ১৯
মানুষের দেহ ও আত্মা উভয়ই রোগাক্রান্ত হয় ২১
শিশুর প্রথম শিক্ষাঙ্গন ২৩
শিশুর বিকাশ..... ২৫
শিশুর খেলাধুলা..... ৩৫
ব্যতিক্রমধর্মী শিশু ৩৭
অটিজম ৪৩
প্যারেন্টিং এর বিভিন্ন দিক ৫১
অভিভাবকদের করণীয় ৫৪
বাচ্চার সাথে মিথ্যা আশ্বাস ৫৫
ভালোবাসার ভারসাম্য ৫৭
সুলতানা রাজিয়া..... ৫৯
সহায়ক গ্রন্থাবলী..... ৬৪

বইটি কেন পড়বেন?

একটি শিশু একটি স্বপ্ন। একটি সুস্থ শিশু সকল বাবা-মায়ের প্রত্যাশা। সময়ের সাথে সাথে একটি শিশু শারীরিক মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বেড়ে সে হয়ে ওঠে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কিন্তু অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও ঘটতে দেখা যায়। অনেক শিশু নানা ধরনের প্রতিকূলতা নিয়ে জন্মায়। এইসব সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিকার ও প্রতিরোধযোগ্য। একটু সচেতনতা দিতে পারে শিশুকে সুস্থ সুন্দর অনাবিল প্রশান্তিময় জীবন। আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে আমরা তার জন্য একটি সুন্দর সাজানো বাগান চাই। মা-বাবার ঘরটা হয়তো শিশুর জন্য সাজানো বাগান। কিন্তু এই পৃথিবীকে আমরা কি তার জন্য সুন্দর সাজানো বাগানের মতো করতে পেরেছি? অথবা সুকান্তের সেই বাসযোগ্য পৃথিবী? হয়তো পেরে উঠি না আমরা; কিন্তু একটি শিশুকে আমরা যদি বড় করে তুলি আপন মমতায়, সঠিক ও পূর্ণ বিকাশে তাহলে সে হয়তো তার পৃথিবীটাকে তার মনের মতো করেই বাসযোগ্য করে তুলবে। মনের মতো সাজাবে তার আপন পৃথিবী নামের বাগানটাকে।

আজকের সুস্থ-সবল ও বুদ্ধিদীপ্ত শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। তাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার এই শিশুদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বুদ্ধি বিকাশে পিতামাতা, পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে নিজের ইচ্ছা, প্রভাব, স্বপ্ন চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। নামিদামি স্কুলে ভর্তি, ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে গিয়ে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট করে শিশুর মানসিক শারীরিক বুদ্ধির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করবেন না।

শিশুদের নিয়ে কাজ করার একটা ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। কারণ আমি যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম তখন এই শিশুদের সাথে মিশতে গিয়ে লক্ষ্য করি, প্রতিটি শিশুই স্বতন্ত্র এবং বৈচিত্রময়। প্রত্যেককেই আবিষ্কার করা যায়। তাদেরকে আমি শিখিয়েছি, তবে সত্যি বলতে আমিও তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র শিশুর একাডেমিক দিকটাকেই গুরুত্বের সাথে

বিবেচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উপর স্টিম রোলার চালানো হয়। আমাদের সময় আমরা স্কুল থেকে পড়াশোনার বাইরে অনেক কিছু শিখতাম। এখনকার স্কুলগুলোতে নৈতিক শিক্ষা, সামাজিকতা শিক্ষা, মানসিক সঠিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশের উপর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী নেই। কিছু প্রতিষ্ঠানে নামমাত্র কিছু কর্মসূচী বা উদ্যোগ থাকলেও বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ের কোনো গুরুত্বই নেই। বর্তমান যান্ত্রিক-বস্তুবাদী সভ্যতা আমাদেরকে এতটাই যান্ত্রিক করে ফেলেছে, এতটাই আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর করে তুলেছে যে, আমরা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু কল্পনাই করতে পারি না। ছোটবেলা থেকেই শিশুকে শেখানো হয়- 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'। কোমল মনগুলোতে এই কথা এমনভাবে গেঁথে যায় যে বড় হতে হতে তাদের একমাত্র টার্গেট থাকে লেখাপড়া করে বাড়ি-গাড়ি করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই উচ্চাকাঙ্খার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যা কিছু তাদের বাধা সৃষ্টি করে তাই তারা ছুড়ে ফেলে দেয়। কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এহেন কাজ নেই তারা করে না। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে মনে, যে যত বেশি শিক্ষিত সে তত বেশি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। শিক্ষা হবে মানুষের কল্যাণে। শিক্ষা গ্রহণ করে জাতির কল্যাণে কিভাবে ভূমিকা রাখা যায় সে বিষয়ে কাজ করা, চিন্তা ভাবনা করা, শিক্ষার মূল টার্গেট হওয়ার কথা ছিল এটাই অথচ হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। আজ দেশের সবচেয়ে বড় বড় দুর্নীতি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় বড় শিক্ষিত শ্রেণির লোকদের দ্বারা। উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে শিশুদেরকে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেশপ্রেম এমনভাবে শেখানো হয় যে, বড় হয়ে তাদেরকে দিয়ে কেউ শত চেষ্টা করেও দেশের ক্ষতি হয় এমন কাজ করাতে পারবে না। অথচ আমাদের দেশে একশ্রেণির লোক স্বার্থ রক্ষার জন্য পুরো দেশ বিক্রি করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাই শিশুদের নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য।

এবার আসি চিকিৎসা পদ্ধতির কথায়। যদিও মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পরেই চিকিৎসার স্থান। তবুও এই চিকিৎসার বিষয়টাও এখন আর সেবার পর্যায়ে নেই। অনেকটাই ব্যবসায়িক পর্যায়ে চলে গেছে। এইখানে সেবার দিকটা তেমন একটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। তবে আপনি যদি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে ভালো চিকিৎসা সেবা পাবেন। আমাদের দেশের বেশিরভাগ জনগণ যেহেতু দারিদ্রসীমার নিচে

বসবাস করে সেহেতু আমাদেরকে তাদের সবার কথা চিন্তা করে চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। কম খরচে কিভাবে ভালো চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয় সেই বিষয়ে ভাবতে হবে। পূর্বেই বলেছি যে, বড় হয়ে গাড়ি-বাড়ি করাই একমাত্র লক্ষ্য যে শিশুদেরকে শেখানো হয় তারা কিভাবে সেবার কথা চিন্তা করবে? তারা প্রথমে চিন্তা করে আর্থিকভাবে সে কতটুকু লাভবান হচ্ছে, তারপর রোগীর সেবা বা সুস্থতার কথা চিন্তা করে। আজকাল চিকিৎসাও অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। পরিতাপের বিষয় হলো, এই আমলাতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে শিশুরা।

তাই আমার ইচ্ছা হলো আমি এমন একটা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবো যার তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, ডে-কেয়ার এবং শিশুদের লালন পালনের সাথে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা- সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি প্রোগ্রাম পরিচালনা করবো। সেই লক্ষ্যকে সামনে লেখে 'আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন' নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে 'আপন চাইল্ড কেয়ার হোম' নামে একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। যেখানে শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে একঝাঁক নিরলস পরিশ্রমী সেবাদানকারী মানুষ।

এই বইটাতে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি একটি শিশুর বিকাশের প্রারম্ভিক ধাপগুলো।

আমাদের অবিভাবকদের কোন কোন ভুলের কারণে শিশুর ও তার পরিবারের উপর নেমে আসে সীমাহীন ভোগান্তি।

শিশু মনোবিজ্ঞানী

ডা. সুলতানা রাজিয়া

চেয়ারম্যান, আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন

পরিচালক, আপন চাইল্ড কেয়ার হোম

কনসালটেন্ট, প্রাইম হাসপাতাল মাইজদী নোয়াখালী।

প্রাক্তন কনসালটেন্ট, ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল কাকরাইল, ঢাকা।

চেম্বারে ক্ষণিক দেখা আমার অভিজ্ঞতা

আবিদ

আবিদ পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তার মা চেম্বারে নিয়ে আসলো এইজন্য যে, তার পড়াশোনায় কোনো মনোযোগ নেই। বাচ্চাটার সাথে অনেকক্ষণ কথা বললাম, সে সবকিছু ঠিকঠাক রেসপন্স করলো। কিছু ম্যানেজম্যান্ট দিলাম প্যারেন্টকে আর তাকে কিছু কাউন্সেলিং করলাম। এরপর আরও কয়েকটা সেশনে সে এসেছে। অথচ কোনো সেশনেই আবিদকে কখনও হাসতে দেখলাম না। একদিন তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি হাসো না কেনো? কখনও তোমার হাসিমুখ দেখলাম না। তোমার কি এইখানে আসতে ভালো লাগে না?" সে উত্তর দিলো, "আমি হাসতে পারি না, হাসতে ভুলে গেছি।" আমি খানিকটা অবাক হয়েই আবারও জিজ্ঞেস করলাম কারণটা কি জানতে পারি? তখন সে বললো তার মনের যত কথা। মনে হলো বাধভাঙ্গা জোয়ারের মতো উপচে পড়ছে তার অনুভূতিগুলো একের পর এক। তার ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে কিন্তু মা খেলতে দেয় না, অনেক বলার পর একটা ক্রিকেট একাডেমিতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। মা সারাদিন শুধু পড়তে বলে। পড়া শেষ করে যখন ডাইনিং টেবিলে খেতে বসি তখনও বই হাতে দিয়ে বলেন, খেতে খেতে পড়, আবার যখন টেলিভিশন দেখতে বসি, তখনও বলেন হোমওয়ার্ক করতে করতে টিভি দেখো, সময়টা কাজে লাগাও।" এইভাবে ছোটবেলা থেকে আম্মুর নিয়মশৃংখলা মানতে মানতে আমি হাসির সময় পাই না। সময়ের সাথে সাথে এখন আর কোনো কিছুতেই হাসি হাসে না, হাসতে পারি না। আমি খুবই মর্মাহত হলাম যা ভাষায় বোঝানো যাবে না। ছেলেটার মায়াভরা চোখদুটো এখনও আমাকে কষ্ট দেয়।

কয়েকটা সেশনের পরও আবিদের মাকে তার চিন্তা-ভাবনার থেকে বিন্দুমাত্র সরানো গেলো না। আবিদের বাবারও একই অভিযোগ স্ত্রীর সর্ম্পকে। পরে জানতে পারলাম, আবিদের মা নিজেও এমন একটা কঠোর নিয়ম-শৃংখলা শেখা পরিবার থেকে বড় হয়েছে। সে তার এই শিক্ষা তার সন্তানের উপর এপ্লাই করেছে। অথচ চিন্তা করে দেখে নি, সবার জন্য সব নিয়ম কার্যকর হয় না। আবিদকে আর কখনও তার মা চেম্বারে নিয়ে আসে নি। প্রায়ই তিনি সিরিয়াল নিতেন তবে আসতেন না। মনে হয় আবিদের আগে তার মায়ের চিকিৎসার প্রয়োজন বেশি জরুরী ছিলো। আমাদের একটু সচেতনতার অভাবে আমাদের আদরের সন্তানের শৈশব-কৈশোর এভাবেই হারিয়ে যায় অতিরিক্ত নিয়মের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে।

আসিফ

আসিফ (ছদ্ম নাম), বয়স ১২ বছর। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তাকে যখন চেম্বারে আনা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আসিফের কি সমস্যা? তার মা বললেন, আপা সে যখন যা চায় তাই কিনে দিতে হয়। এই কথা বলে আসিফকে রুমের বাইরে যেতে বলে তার মা কান্নায় ভেঙে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, আপা আমার ছেলে আমাকে মেরেছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি বলছেন আপনি!! কেনো? আর কীভাবে মেরেছে? তখন মা বললো, যে তাকে মোটর সাইকেল কিনে দিতে হবে। আমি বলেছি এখন দিবো না। এইজন্য সে আমাকে হাতের মধ্যে সর্বশক্তি দিয়ে ঘুষি দিতে দিতে কালো করে ফেলেছে। মায়ের মুখে এমন দুঃখজনক ভয়াবহ ঘটনা শুনে আমি আসিফের শিশুকালের ইতিহাস জানতে চাইলাম। কথায় কথায় জানতে পারলাম, সে পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান। তার বাবা, চাচারা সব দেশের বাইরে থাকে। ছোটবেলা থেকেই আসিফ অনেক আদর যত্নে বড় হয়েছে। সে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই তার সামনে এনে হাজির করা হতো। তিন বছর বয়সে বাবা বিদেশ থেকে নোটবুক পাঠিয়েছে। চাচা ভিডিও গেমস পাঠিয়েছে। এইভাবে সবকিছু পেয়ে পেয়ে তার চাহিদাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর অভিভাবকগণ সেই চাহিদা পূরণও করেছে। এমতাবস্থায় যখন সে ১২ বছর বয়সে মোটরবাইক চালাতে চাচ্ছে তখন অভিভাবকগণ নিরাপত্তার কথা ও বয়সের কথা চিন্তা করে তাকে মোটরবাইক কিনে দিতে আগ্রহী নয়। ফলশ্রুতিতে সে তার মায়ের সাথে এমন ভয়ংকর আচরণ করছে যাতে করে তাকে মোটর বাইক কিনে দেয়া হয়। আসিফের বর্তমান এই আচরণের জন্য দায়ী অতীতে তার সব আবদার মেটানো হয়েছে সাথে সাথেই। তাই সময়ের সাথে সাথে সে শিখে ফেলেছে, সে যখন যা চাইবে তাই পাবে। যতক্ষণ না পাবে, ততক্ষণ কাঙ্খিত বস্তু পাওয়ার জন্য সে সবরকমের আচরণ এপ্লাই করতে থাকবে।

আমাদের মনে রাখা উচিত: সন্তান যখন যা চায় তা সাথে সাথে কিনে দেয়া বা সরবরাহ করা উচিত নয়।

১১

মিথিলা

মিথিলা (১৪)। মিথিলার পড়াশোনায় অমনোযোগ, অতিরিক্ত জেদ, মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্তি। মিথিলার সাথে এইটাই ছিলো আমার প্রথম সেশন। এরপর মা ও মেয়ের সাথে ১০/১৫ টা সেশনে কথা বলেছি। ধীরে ধীরে জানতে পারি, মিথিলার মোবাইল ফোনের প্রতি আসক্তি আর স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই। এইটা অস্বাভাবিকতায় রূপ নিয়েছে অনেক আগেই। অতীত ইতিহাস নিয়ে জানতে পারি যখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ে তখনই তাকে একটা স্মার্ট ফোন কিনে দেয় তার বাবা। তখন থেকেই কাজিনদের সাথে নিয়ে সে ফেসবুকে একাউন্ট ওপেন করে, ম্যাসেঞ্জারে কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা। কয়েকদিন পর পর ছেলেবন্ধু পরিবর্তন করে। এই ছিলো ওর নেশা। এই নেশা থেকে তাকে বের করার জন্য আর বাবা-মা তাকে ৩/৪ বার রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি করিয়েছিলো। এক একবার ১০/১৫ দিন কওে রেখেছে। কিন্তু তাতে কোনো কার্যকরী ফল পাওয়া যায় নি। সে আর করবে না বলে বাসায় আসে। দিন কয়েকপর আবারও একই কাজের পুনরাবৃত্তি করে। তার সাথে দীর্ঘদিনের আলাপচারিতায় আমি বুঝতে পারি, সে কোনো প্রেম-ভালোবাসার সর্ম্পকে জড়ায় নি। যে কোনো ছেলেদের সাথে কথা বলবে, ভিডিও চ্যাট করবে এইটা তার একধরণের নেশা। এই নেশা শেষ পর্যন্ত এক ভয়ংকর নেশায় রূপ নিয়েছে। এখন সে ভিডিওতে তার সেক্সুয়াল কর্মকান্ড করে। ওপাশ থেকে ছেলেটাও একই কাজ করে। মিথিলা তার মাকে সরাসরি বলে দিয়েছে এই কাজ করা ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। তাকে মোবাইল ফোন থেকে সরিয়ে রাখার বারংবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পরও আশানুরূপ কোনো ফল পাওয়া যায় নি। একদিন সে তার বাবা-মায়ের সামনে নগ্ন হয়ে যায়, তাদেরকে বাধ্য করে মোবাইল ফোন দেয়ার জন্য। আমাদের সেশনগুলোতে তাকে ৭০% সুস্থ করে তুলতে পেরেছিলাম আমরা। পাশাপাশি মেডিকেশনও চলেছে। অথচ এরপর তার বাবা-মা আর নিয়মিত করে নি।

ছোটবেলার আদর করে মোবাইল ফোন কিনে দেয়ার পরিণতিটা
ছিলো এইরকম ...

হেরা

৪ বছরের মেয়ে হেরা, একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে। তার মা-বাবার সাথে একদিন আমার চেম্বারে আসলো। মেয়েটা চেম্বারে প্রবেশ করার সাথে সাথে তার আচরণের দিকে আমার নজর পড়লো। দেখতে পেলাম সে কোনো এক অন্যজগতের মধ্যে ডুবে আছে। চারপাশের পরিবেশের সাথে তার তেমন কোনো একটা যোগাযোগ নেই, আগ্রহও নেই। তার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়ের কি সমস্যা? মা বললেন, আমার মেয়ে বয়স অনুযায়ী কথা বলছে না। শুধুমাত্র মা, বাবা বলতে পারে, তাও মনে হয় যে, নিজের মনেই বলে। আমি তখন বাচ্চাটাকে আরও গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলাম এবং তার মা-বাবাকে কিছু প্রশ্ন করলাম তার দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে। পুরো বিষয়টা জানার ও বোঝার পর আমি তার বাবা-মাকে বললাম, আপনার সন্তানের একটা সমস্যা আমি আঁচ করতে পারছি। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাদেরকে মন শক্ত করতে বললাম। বললাম যে. আপনার মেয়ের অটিজমের সমস্যা আছে। ছোটবেলায় তাকে অতিরিক্ত পরিমাণে মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখানো হয়েছে। তার সাথে কথা বলা বা খেলাধুলা করা হয়নি। শুধুমাত্র মোবাইল ফোন দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর দীর্ঘ তিন বছর তার চিকিৎসা করার পর, আলহামদুলিল্লাহ সেই মেয়ে এখন মোটামুটি সুস্থ আছে। অন্য আর দশজনের মতো স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশোনা করছে।

নিলীমা

নিলীমার বয়স ৫ বছর। কথা বলেনা, ডাকলে তাকায় না, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে না, পড়াশোনা করানো যায় না ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আমার চেম্বারে আসলো। বাচ্চাটাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর আমি দেখলাম যে, তার বয়স অনুযায়ী বিকাশের স্তরগুলোতে সে পিছিয়ে আছে। তার বসা, হাঁটা, দাঁড়ানো সবই দেরি করে হয়েছে। এরপর যে বিষয়টা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা হলো তার বাবা-মা উভয়ই চাকুরীজীবি। তারা জীবিকার প্রয়োজনে সারাদিন বাইরে থাকে। মেয়েটা জন্মেও পর থেকে তার মা-কে তেমন একটা কাছে পায় নি। বাচ্চাটা তার নানী এবং একটা আয়ার কাছে বড় হয়েছে। তার সাথে তেমন একটা কথা বলা হয় নি। খেলাধুলা করা হয় নি, তাকে কোনো কিছু শেখানোও হয় নি। ফলে তার কথা বলা, বুদ্ধি বিকাশ বয়সের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিলো। বাচ্চাটা যখন খুব কান্নাকাটি করতো তখন তার নানী তাকে মোবাইল ফোন দিয়ে অথবা টিভিতে কার্টুন দিয়ে বসিয়ে রাখতো। আমরা অনেক সময় যাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থের পেছনে দিন-রাত দৌড়াই সেই অতি আদরের সন্তানের ভবিষ্যৎ আমরা নিজেরাই আমাদের অজ্ঞতা আর সচেতনতার অভাবে নষ্ট করে দিচ্ছি। নিলীমার মা-কে আমি বললাম, যে সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে আপনি মরিচীকার পেছনে দৌড়াচ্ছেন সেই সন্তানকে সুস্থ করতে হলে আপনাকে এই দৌড় বন্ধ করতে হবে। বাচ্চাকে কোয়ালিটি সময় দিতে হবে, বাসায় থাকতে হবে। আপাতত চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে। কয়েকটা সেশন কাউন্সেলিং করার পর নিলীমার মা-কে বিষয়টা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। ফলে তিনি এখন পুরোটা সময় তার মেয়েকে দিচ্ছেন। ছয়মাস পর বাচ্চা যখন কথা বলা শুরু করেছে তখন মায়ের চোখদুটো সফলতার আনন্দে ছলছল করছে। আমি বললাম, আপনার সন্তানের জন্য আপনিই বড় সাইকোলজিস্ট। আপনার নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে আজ ধীরে ধীরে সুস্থ জীবনে পর্দাপন করছে।

অনেক সময় আমাদের একটুখানি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের সন্তানদের অনেক বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রায়হান

১৫ বছরের কিশোর রায়হান। শান্ত-শিষ্ট চেহারার একটা ছেলে একদিন তার মায়ের সাথে আমার চেম্বারে আসলো। ছেলের সর্ম্পকে মায়ের অভিযোগ গুলো হলো- তার পড়াশোনায় একদমই মনোযোগ নেই। আগে পড়াশোনা করতো, সে অনেক মেধাবী ছাত্র। দিন-দিন কেমন যেনো অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। সারাদিন একা একা রুমে থাকে। বন্ধুদের সাথে আগের মতো খেলাধুলা করে না। প্রাণোচ্ছলতা নেই, কেমন যেন মনমরা, উদাস হয়ে থাকে। খাবারের প্রতি অরুচি জন্মেছে, স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। আমি ধীরে ধীরে তার সাথে কথা বলা শুরু করলাম। রেপো বিল্ড করার পর সে একদিন আমার কাছে কিছু কথা শেয়ার করলো। রায়হান বলছে, ম্যাডাম এখন আমি আপনাকে কিছু কথা বলবো, আপনি আমার মায়ের কাছে বলতে পারবেন না। আমি তাকে আস্বস্ত কওে বললাম যে, কাউন্সেলিং এ একটা অন্যতম নীতি হলো ক্লায়েন্টের সকল গোপনীয়তা রক্ষা করা। তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো। তখন একে একে সে তার সমস্যার কথা বলতে শুরু করলো। কবে থেকে তার এই সমস্যা শুরু হয়েছে এবং কাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে এই কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে ইত্যাদি সবকিছু।

সে বলতে শুরু করলো- "আমি তখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি। আমার চেয়ে দুই-তিন ক্লাস বড় কয়েকজন কাজিন ছিলো আমার। তারা প্রায়ই মোবাইল ফোনে কি যেনো দেখতো। একদিন আমি বললাম তোমরা কি দেখো এত মনোযোগ দিয়ে? তারা আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে বললো যে, "আয় তুইও দেখ খুবই মজার জিনিস। একবার দেখলেই আর ভুলতে পারবি না। তখন আমাদের মতো সবসময়ই দেখবি।" এই প্রথম আমি দেখলাম তারা মোবাইল ফোনে কি দেখে। ধীরে ধীরে তাদেও সাথে দেখতে দেখতে একটা সময় আমি এই ভিডিওগুলো দেখাতে আসক্ত হয়ে পড়ি। একদিন তারা আমাকে জোর কওে বাথরুমে নিয়ে যায় এবং একটা কাজ (হস্তমৈথুন) শিখিয়ে দেয়। প্রথমে আমি অনেক বাধা দিলেও তারা সেটা শুনে নি। তারা বলেছে, "প্রথম প্রথম খারাপ লাগলেও দেখবি একটা সময় খুব মজা পাবি। এরপর সাময়িক আনন্দ পাওয়ার জন্য ঐ কাজটার সাথে আমি ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ি। "ম্যাডাম এতদিন পর আমি বুঝতে পারছি যে, আমি একটা

অন্যায় কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছি। দিন দিন স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমার কোনো কাজে মন বসে না, পড়তে ভালো লাগে না। এখন আমি কি করবো? আমি বাঁচতে চাই, আমি সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চাই। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারছি না। আপনি আমাকে সাহায্য করেন।" এই কথা বলেই সে কাঁদতে শুরু করলো।

সঙ্গদোষ এবং অভিভাবকদেও অসচেতনতা অর্থাৎ সন্তান কাদের সাথে মিশছে, কি করছে, কি ধরণের খেলা খেলছে তা না জানার কারণে কুঁড়িতেই অন্ধকার জগতে তলিয়ে যাচ্ছে আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ।

ইরিনা

ইরিনা, বয়স ৫ বছর। বাবা-মা সেপারেশনে আছে। মেয়েকে নিয়ে কখনও বাবা আসেন আমার কাছে, কখনও মা। একদিন আমি বাবাকে বললাম, আপনারা দুইজন একসাথে বাচ্চাকে নিয়ে আসলে আমাদের জন্য কাউন্সেলিং করতে সুবিধা হয়। তখন বাবা ইত:স্তত করতে করতে বললো যে, আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমরা দুইজন দুইজায়গায় থাকি। ইরিনা বেশিরভাগ সময় তার মায়ের কাছেই থাকে। মাসে একবার আমার কাছে আসে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর আমি বললাম, আপনার সন্তানের যে সমস্যার কারণে এসেছেন তা এবার বুঝতে পারলাম। এত ছোট্ট বয়সে তাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া সে সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। ইরিনার মা মেয়েকে বাবার কাছে খুব একটা দিতে চায় না। অথচ মেয়েটা তার বাবাকে প্রচন্ড ভালোবাসে। এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। মুখে বলেও না আমি বাবার কাছে থাকবো, বাবার কাছে যাবো। তবে তার নিরীহ, অসহায় কচি দুটো চোখ বাবার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার জানান দিচ্ছে। যখন সে বাবাকে দেখতে পায় তখন খুব হাসিখুশি থাকে, অনেক কথা বলে, খেলাধুলা করে। আর মায়ের কাছে যখন থাকে তখন মনমরা হয়ে থাকে, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে না। কারণ ছোটবেলায় বেশিরভাগ সময় ইরিনা তার বাবার কাছেই থাকতো। মা চাকুরীর প্রয়োজনে বাইরে থাকতো বেশি। বাবার ব্যবসার কাজ দেখাশুনা করার জন্য মাঝে মাঝে গেলেই হতো। ৫/৬ টা সেশন শেষ করার পরও তার ইরিনার মা মেয়েকে বাবার কাছে দিতে সম্মত হচ্ছে না। ওদিকে মেয়ে বাবা-মা দুইজনকেই চায়। সেই কষ্ট থেকে দিন দিন সে নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছে। সন্তানের এই অবস্থার জন্য তারা দুইজনই যে দায়ী সেটাই তারা বুঝতে পারছে না। তার চিকিৎসা করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো বাবা-মা। তাই যখন বাবা-মা কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন তখন নিজেদের জীবনের আগে সন্তানের জীবনের কথা সর্বপ্রথম চিন্তা করবেন এবং বিবেচনা করবেন। কেননা আমাদের একটা ভুল সিদ্ধান্ত শেষ করে দিতে পারে পরম আদরের কচি জীবনগুলো।

নিশি

নিশি (ছদ্ম নাম) বয়স- ১৪ বছর। গত এপ্রিল মাসে আম্মুর সাথে ডাক্তার দেখানোর পর একটি তন্দুরী চিকেন খেলাম। কিন্তু রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর একটা ভয়ংকর চিন্তা মাথায় ভর করলো। মনে হলো আমি মানুষের হাত চিবিয়ে খাচ্ছি। কিছুদিন পর সেই বিষয়ে আম্মুকে বললাম। আম্মু আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো। ডাক্তার নানাভাবে আমাকে বুঝালো, কয়েকটা ঘুমের ঔষুধও দিলো। ঘুমের ঔষুধ খেয়ে ঘুমালাম। পরদিন ভালোই লাগছিলো। এর পরদিন দুপুরবেলায় ঘুমানোর সময় আবারও সেই পাগলামি শুরু করে দিলাম। আম্মুর হাত দেখলেই মনে হয় কামড় দিয়ে খাই। আম্মু রেগে আমাকে চড় দিলো। তারপরও ঠিক হয় নি। তারপর নানি আমাকে পান্না আন্টির বাবার কাছে নিয়ে গেলো। তিনি আমাকে ফুঁ দিলেন ও একটা কাইতন দিলেন। কিছুদিন ধরে ভালোই লাগছিলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে ভালোই ছিলাম। কয়েকদিন পর আবারও একই রকম খারাপ লাগছিলো। সব কথা ভুলে যাওয়ার জন্য খালি কাঁদি। প্রতিদিনই কাঁদি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে গলায় ফাঁস দিয়ে মরে যাই। কিন্তু আমি স্কুলে থাকলেও আম্মুর বিষয়ে আজব চিন্তা আসে। শুধু শুধুই ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি। এমন স্বার্থপর আমি যে, মরতেও ভয় পাই। এখন আম্মুর প্রতি আমার মায়া কমে যাচ্ছে। আম্মু পা ব্যথায় কষ্ট পেলে আমি চুপ করে বসে থাকি। শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবি। আগে আম্মুর জন্য ভাবতাম, আমি বুঝতে পারছি না কেনো এমন হচ্ছে?

আম্মুকে শুধু কামড় দিতে ইচ্ছে করে। আম্মুর জন্য মায়া বাড়ে আবার কমে। ঘুম থেকে উঠলে আজব অনুভূতি হয়, ঘুমাতে পারি না, চোখও বন্ধ করতে পারি না। ক্ষুধা লাগলেই ভয় লাগে। দুপুরবেলার সময়টা সহ্য হয় না। আম্মু আর আমি যখন একা থাকি তখন মনে হয় কিছু একটা ঘটে যাবে। সবকিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু হয় না। মানুষের শরীর দেখলে নানারকম আজব চিন্তা আসে মাথায়। আম্মুকে নিয়েও খারাপ চিন্তা হয়। খাবার খাওয়ার সময়ও আজব অনুভূতি হয় তাই খেতেও চাই না।

এই হলো বয়ঃসন্ধিকালের এক মেয়ের করুণ কাহিনী। তার সাথে কয়েকটা সেশন করার সুযোগ হয়েছিলো। কথা বলে যতদূর বুঝতে পারলাম, সে একসময় ভয়ংকর কিছু মুভি দেখতো। একসময় দেখা বন্ধ করে দেয়, তবে কিছু বছর পর হঠাৎ করেই তার মনের মধ্যে সেইসব মুভির ভয়ংকর চরিত্রগুলো আসতে থাকে এবং বাস্তবেও সে তা করতে চাইতো। মায়ের বকুনি বেশি খাওয়ার কারণে তার মায়ের প্রতি এই অনুভূতিটা বেশি কাজ করতো।

মীম

মীম (৬ বছর) বাচ্চাটা দেখতে ভারী সুন্দর। যেমন বড় বড় চোখ, তেমন নাদুস নুদুস মায়াভরা চাহনী। অথচ তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, সে কারও সাথে মিশতে পারে না, কারও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না এমন কি কারও সাথে নিজ থেকে কোনো কথাও বলে না। সারাক্ষণই কিসের যেনো ভয় তার চোখে-মুখে লেগেই থাকে। শত চেষ্টা করেও তাকে হাসানো যায় না। মজার বিষয় হলো সে লেখাপড়ায় খুবই ভালো। সব লিখতে পারে। যা দেয়া হয় তাই লিখে দেয়। বাবা-মাও খুব খুশি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, এই বাচ্চার সামাজিক বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে না। তার পারিবারিক পরিবেশের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, তাকে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রাখা হয়। কথা বললেও বকা দেয়, বাড়ির উঠানে খেলতে গেলেও বড়দের ধমক শুনতে হয়। তাকে কিছুদিন আমার পর্যবেক্ষণে পরিচালনা করার প্রায় ২ মাস পর প্রথম সে একদিন কথা বলে। আমি তো অবাক! আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কার সাথে এসেছো?' সে উত্তর দিলো, 'নানার লগে' এটা হলো নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা। পরের দিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি আজ কি নাস্তা খেয়েছো? সে বললো, 'ছা দি হিডা' (চা দিয়ে রুটি)। ধীরে ধীরে আমাদের শিশুবান্ধব পরিবেশে তাকে অনেকটাই স্বাভাবিক করে তুললাম। সে এখন প্রাণখোলা ভাবে হাসে। তার চেহারায় সে ভীতু ভাবটা অনেকটাই কমে গেছে। তার এই পরিবর্তনের কারণ হলো তার সাথে আসলে ছোট বেলা থেকেই আদর-মমতাভরা দরদ ভরা কণ্ঠে কেউ কথাই বলে নি। যে কোনো কাজে শুধু বারণ করেছে, বাধা দিয়েছে। ফলে তার ভেতর যে সুপ্ত প্রতিভা, হাসিখুশি, দুষ্টমিষ্টি একটা আচরণ অর্থাৎ শিশুসুলভ যে চপলতা সেটা চাপা পড়েছিলো। এই প্রথম সে আশ্বস্ত হলো যে, তারও হাসার অধিকার আছে, খেলাধুলা করার অধিকার আছে। যেহেতু মফস্বলের মুসলমান পরিবারের মেয়ে সেহেতু ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে রক্ষণশীলতার মধ্যেই বড় হতে হয়। এই কঠোর রক্ষণশীলতার কারণে কত শিশুদের মধুর শৈশব-কৈশোর যে আমরা ধ্বংস করে দিচ্ছি তা নিজেরাও জানি না।

একটি প্রতিবন্ধী শিশুর ইচ্ছের গল্প

আবিদ, আর দশটি স্বাভাবিক শিশুর মতই হতে পারত তার জীবন। কিন্তু আজ তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা-মায়ের চিন্তার অন্ত নেই। সমবয়সী অন্যান্য শিশুরা যখন মহা আনন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে তখন নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে আবিদ। প্রতিযোগিতার এই সময়ে পিছিয়ে পড়ছে সে প্রতি পদে। এমন বহু আবিদ আমাদের এই সমাজে রয়েছে যাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যথাযথভাবে হয় নি। যাদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন উপহার দেওয়া আমাদেরই কর্তব্য। আমাদের একটু মনোযোগ, একটু সচেতনতা, একটু সহযোগিতাই দিতে পারে তার স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা।

মানুষের দেহ ও আত্মা উভয়ই রোগাক্রান্ত হয়

মানুষ আল্লাহর সবশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এক কথায় তার অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মস্তিষ্ক তাকে অন্যান্য সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক করেছে। কেবল মানুষকেই আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে গড়েছেন। কেবল মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর নিজ রুহ বা আত্মার অংশ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির মত নয়, তার দেহ যেমন আছে তার আত্মাও আছে। মানুষের মনস্তত্ত্বের অধিকাংশই এখনও রহস্যের চাদরে আবৃত। তথাপি মনোবিজ্ঞানীরা এখন শিশুদের দেহ ও মনের বিকাশ সম্পর্কে অনেকটাই অবহিত।

মানুষের দেহ যেমন রোগাক্রান্ত হয় তেমনি তার মন বা আত্মাও দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, পরিবেশ বা মানসিক আঘাত দ্বারা অসুস্থ হয়। আমরা শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের দ্বারস্থ হই কিন্তু মনের অসুস্থতার জন্য কোনো চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়ার ধারণা আমাদের সমাজে নতুন। এখনও আমরা অনেকেই জানি না যে, মনের অসুখ কোনটি এবং তা সারানোর জন্য চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় বা এ সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে।

মানসিক রোগী বলতে আমরা অনেকেই এখনও 'পাগল' বুঝি। দরিদ্র এই দেশের মানুষগুলো যখন শরীরের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে হিমশিম খায় সেখানে তারা মনের অসুখের জন্য চিকিৎসকের কাছে যাবে এমন তো কল্পনাও করা যায় না। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে রয়েছে সীমাহীন অজ্ঞতা। এ সমস্ত কারণে নানাবিধ মানসিক রোগ নিয়েই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে। তাদের নিয়ে পরিবারের সকলে বিব্রত থাকলেও তারা এর কোনো সমাধান খুঁজে পান না।

এই সমাধানের পথ বাতলে দেওয়ার জন্যই বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে গড়ে উঠেছে শিশুবিকাশ কেন্দ্র, মানসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ কেন্দ্র ইত্যাদি। আমাদের দেশেও শিশুর শারীরিক বা মানসিক সমস্যা আছে কিনা অথবা বয়সের তুলনায় বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা চিহ্নিত করা ও সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বেশ কিছু শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু করেছে। শিশুর বিকাশে ঘাটতি থাকলে তা দূর করার জন্য চিকিৎসার পাশাপাশি এসব কেন্দ্র থেকে অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া হয়। দেশের ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ রকম কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলো চিকিৎসক ও অর্থের অভাবে অনেকাংশেই স্থবির হয়ে ভগ্নদশায় পতিত হয়েছে। তবে বেসরকারী উদ্যোগে অনেক মনোবিজ্ঞানীই এই সেবামূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসছেন। অনেকেই টিভি অনুষ্ঠান করে বা পত্রিকায় লিখে গণসচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিশুর প্রথম শিক্ষাঙ্গন

শিশু জন্মের পর প্রথম শেখে তার মায়ের কাছে। মা হলো শিশুর প্রথম শিক্ষক, মায়ের মুখের ভাষাই শিশুর প্রথম ভাষা, তাই তো আমরা বলি মাতৃ ভাষা। মূলত জন্মের আগে মায়ের গর্ভে থাকাকালীনই শিশুর শিক্ষা গ্রহন শুরু হয়। শিশুর শিক্ষা লাভের পেছনে মায়ের পর পরই পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র এসবের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। মা যেহেতু সন্তানের প্রথম শিক্ষক, তাই মা'কে নিজেকে হতে হয় সর্বোত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত। মা যদি সত্যবাদী হয়, সভ্য হয়, ভদ্র হয়, ডিসিপলিনড্ হয়, নিঃস্বার্থ হয়, মানুষের কল্যাণকামী হয়, আল্লাহ ও রাসুলের হুকুম-আহকাম মান্যকারী হয় তবে সন্তানও সত্যবাদী হবে, সভ্য হবে, ভদ্র হবে, ডিসিপলিনড্ হবে, নিঃস্বার্থ হবে, মানুষের কল্যাণকামী হবে, আল্লাহ ও রাসুলের হুকুম মান্যকারী হবে।

সত্যিকার অর্থে নৈতিক শিক্ষা বলে আলাদা কোনো শিক্ষা নেই। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে যখন বস্তুবাদী, যান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক একটি জীবনব্যবস্থা চালু করা হলো তখন মানুষের আত্মার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষার নাম বাদ দিয়ে নৈতিক শিক্ষা নামে নতুন শব্দ ব্যবহার করা হলো। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হলো কলেমা বা তওহীদ, আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুম-বিধান না মানা।

আজ পৃথিবীময় নীতি-নৈতিকতাহীন জীবনব্যবস্থা চর্চা করা হচ্ছে, মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, একজনের প্রতি অন্যজনের মায়া-মমতা, ভালোবাসা, অনুভূতি, ঐক্য, শৃংখলা যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তাতে করে আমরা যদি আমাদের সন্তানকে একটি বাসযোগ্য পৃথিবী দিয়ে যেতে চাই তবে আমাদের নারীদেরকে সর্বপ্রথম নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সেই নৈতিক শিক্ষা হলো-জীবনের সর্বস্তরে স্রষ্টার হুকুম ছাড়া আর কারও হুকুম মানা যাবে না। যখন একজন মা তার সন্তানকে ছোটবেলা থেকে এই শিক্ষা দিবে, তখন সেই সন্তান জীবনের যে স্তরেই যাক না কেনো সর্বদা তার অন্তরে জাগ্রত থ াকবে স্রষ্টা কোন কাজ করতে বলেছেন, কোন কাজ করতে নিষেধ করেছেন, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোন কাজে মানুষের কল্যাণ হবে কোন কাজ করলে মানুষের অকল্যাণ হবে। তবে সেই সন্তানের দ্বারা কোনদিন দেশ ও জাতির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

শিশুর বিকাশ

শিশুর বিকাশ বলতে বোঝায় তার বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে যে কাজ সেই কাজ সে ঠিকঠাক করছে কিনা এবং দক্ষতার বিকাশ হচ্ছে কিনা। এটি তার মনোসামাজিক আচরণের দিক নির্দেশ করে। সুতরাং শিশুটির বৃদ্ধির ধরনে লক্ষ রাখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তার বিকাশের দিকেও নজর রাখা ততটাই জরুরি। সে কারণে শিশুর বিকাশের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই মাইলফলকগুলি ছোঁয়ার স্বাভাবিক সীমা আছে এবং এই মাইলফলকগুলি ছোঁয়ার ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও থাকতে পারে। শিশুর বৃদ্ধি কেমন হচ্ছে সে দিকে স্বাস্থ্যকর্মী যেমন নজর রাখবেন, তেমনই শিশুর বিকাশের মাইলফলকগুলিও পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে মা এবং পরিবারের সদস্যদের শিক্ষিত করে তুলবেন যাতে শিশুটির মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে তারা প্রয়াসী হোন।

শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে রয়েছে জীবগত কারণ যেমন: জিনগত উত্তরাধিকার, বয়স, লিঙ্গ, জন্মের

পরে মা ও শিশুর পুষ্টি; রয়েছে পরিবেশগত কারণ যেমন, ভালো বাসস্থান, সূর্যালোক, নিরাপদ পানীয় জল, ডায়রিয়ার মতো অসুখ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিবেশ ইত্যাদি; রয়েছে পরিবারগত কারণ যেমন: পরিবারের আয়তন, একাধিক শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে সময়ের ফারাক, গর্ভাবস্থায় যত্ন ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির বেশির ভাগই পরিবার এবং বিশেষত মহিলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। একটি শিশুর শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশের দিকেও সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক বৃদ্ধি হলো শারীরিক বিকাশ। আর মানসিক বিকাশ হলো আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা, কথা বলা, অনুভূতি ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষমতা অর্জন। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ছাড়া শিশু তথা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। গর্ভকালে মায়ের অপুষ্টি, মা-বাবার মধ্যে কলহ, পারিবারিক নির্যাতন, মাদকাসক্তি, থাইরয়েড ও অন্যান্য হরমোনের আধিক্য ও অভাব, জন্মগত ত্রুটি, প্রসবকালীন জটিলতা, শব্দদূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ইত্যাদি কারণে শিশুর বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশকে উন্নত করতে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখা জরুরি।

গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে শিশুর বিকাশের অধিকাংশটুকুই জন্ম থেকে প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে হয়ে যায়। এই সময় শিশু যে পরিবেশে বড় হয়, যে ধরণের আচার-আচরণের সম্মুখীন হয় বা মোকাবেলা হয় তাই তার পরবর্তী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষই একমাত্র প্রাণি যার মস্তিস্কের বিকাশ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। জন্মের পর ব্রেনের ওজন থাকে ৩৫০-৪০০ গ্রাম। জন্মের পর প্রথম ৫ বছর মানুষের ব্রেন প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। বাবা-মা অথবা অভিভাবক যদি শিশুকে স্বাধীনভাবে খেলাধুলার সুযোগ করে দেয় তাহলে মস্তিস্কে প্রতিদিন সংযোগ বাড়তে থাকবে। আর যদি খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টি করে না দিয়ে তাকে ডিজিটাল ডিভাইস যেমন: টিভি, মোবাইল ফোন, ভিডিও গেইমসের সামনে বসিয়ে রাখেন তবে তার প্রারম্ভিক বিকাশ ব্যহত হবে এবং পরবর্তী জীবন এর নেতিবাচক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হবে।

২৭

শিশুর শারীরিক বিকাশঃ

বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক বৃদ্ধিই হলো শারীরিক বিকাশ। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের স্বাস্থ্য, অসুখ, পরিবেশ, মা-বাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ, অপুষ্টি, পারিবারিক নির্যাতন, মানসিক চাপ, মাদকাসক্তি, থাইরয়েড বা অন্যান্য হরমোনের আধিক্য ও অভাব জন্মকালীন জটিলতা, শব্দদূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ইত্যাদি কারণে শিশুর বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। জন্মের পর শিশুর সাথে অতিরিক্ত পরিমাণে খারাপ আচরণ করা হলে, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হলে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রভাবিত হয়। অনেক সময় অসুস্থ ও খাটো আকৃতির হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া ও রোমানিয়ায় এতিমখানার শিশুদের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে, যে সমস্ত এতিমখানায় শিশুদের প্রতি খারাপ আচরণ করা হয়েছে, তাদের খেলাধুলার বিষয়ে কঠোরহস্তে দমন করা হয়েছে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে তারা যেমন মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি শারীরিকভাবেও খাটো হয়ে গেছে।

শিশুর মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশঃ

বিশিষ্ট শিশু মনোবিজ্ঞানী পিঁয়াজে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, শিশুরা নিজেরাই নিজের জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে পারে। যুক্তির ধারণা নিয়ে কোনো শিশু জন্মায় না বরং পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে যুক্তির ধারণা তৈরি হয়। তাই শিশুকে যত বেশি প্রকৃতির কাছাকাছি আনা যায়, নতুন নতুন বিষয়ের সম্মুখীন করা যাবে ততই তার মধ্যে জানার কৌতুহল সৃষ্টি হবে, আবিষ্কারের নেশা জন্ম নিবে এবং সৃজনশীলতা তৈরি হবে। অথচ আমরা প্রায়শই সন্তানের এইসব বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাই। শুধুমাত্র পড়াশোনার দিকে মনোযোগী করতে চাই। অনেকেই আমার কাছে এসে অভিযোগ করে আমার শিশুর সারাদিন ছবি আঁকে, কাগজ কেটে কেটে কি যেন বানায়? খেলনা ভেঙ্গে জোড়া দেয়, আবার পার্টসগুলোকে খুলে খুলে নিজের মতো করে জিনিস বানায়। সারাদিন এইসব করে। পড়াশোনায় তেমন মনোযোগ নেই। আমি তাদেরকে বলি, আপনার সন্তানের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে বিকশিত হতে দিন। হতে পারে আপনার সন্তান খেলনার পার্টস খুলে নতুন কিছু বানাতে বানাতে একদিন ইঞ্জিনিয়ার হবে, হতে পারে ছবি আঁকতে আঁকতে একদিন লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির মতো বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর হবে, কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে করতে একদিন হয়তো বা অনেক নামিদামি ফ্যাশন ডিজাইনার হতে পারে। তাদের ভেতর লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে বের হয়ে আসতে দিন, বাধা দেবেন না। এই বয়সে শিশুর মেধা যতদ্রুত কাজ করবে তা পরবর্তী দিনগুলোতে ধীরে ধীরে কমে আসবে।

২৯

সামাজিক বিকাশঃ

শিশুরা যখন অন্য শিশুদের সাথে মিশে, খেলাধুলা করে এতে তাদের সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়। ইদানিং আমাদের সন্তানেরা একক পরিবারে বড় হয়, বাবা-মা কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে থাকে বেশিরভাগ সময়। আর সন্তানেরা পোষা পাখির মতো ঘরের কোণে বন্দি। নেই কোনো খোলা মাঠ, নেই কোনো খেলার জায়গা, নেই কোনো সমবয়সী খেলার সাথী। তারা শেয়ারিং শেখেনা, খুনসুটি শিখে না, একজন আরেকজনের বিপদে এগিয়ে যায় না, মিলেমিশে একই খেলনা দিয়ে ভাগ করে খেলে না। যার ফলে তারা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে বড় হয়। দুইতিন বছর বয়সে সামাজিক খেলার মাধ্যমে একটা শিশু যে সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে তাই তার পরবর্তীকালে স্কুল জীবনে সহপাঠী এবং পরিণত বয়সে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে মিলেমিলে কাজ করার যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে। সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা করলে, খেলাধুলা করলে শিশু সহযোগিতা, সহমর্মিতা, স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, পরোপকারী এইসব মানবিক গুণগুলো অর্জন করতে পারে।

আবেগিক বিকাশঃ

মানুষ সামাজিক জীব। যার আবেগের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না, সে সমাজে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠে। হাসি, কান্না, রাগ, অভিমান ইত্যাদি হলো আমাদের বিভিন্ন প্রকার আবেগের বহিঃপ্রকাশ। যার মধ্যে মানবিক গুণসম্বলিত এইসব বৈশিষ্ট্য থাকে না সে চেহারায় মানুষ হলেও কার্যত রোবট হয়ে যায়। তাই সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের স্বার্থে আবেগের সুষ্ঠু বিকাশ প্রয়োজন। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, খেলাধুলা করা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার যোগ্যতা বিকশিত হয়। ছবি আঁকার মাধ্যমে অনেকসময় শিশু তার আবেগকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়, মিছেমিছি (প্রিটেন্ড প্লে) এর মাধ্যমে শিশু তার স্বপ্ন, ভয় ইত্যাদিকে প্রকাশ করার পথ খুঁজে পায়। আবেগের সঠিক বিকাশের মাধ্যমে শিশুর আবেগ শতধারায় ডানা মেলে বিকশিত হও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর রূপকার হবার পথ খুলে দেয়।

নৈতিক বিকাশঃ

আজকাল বাবা-মায়েরা শিশুর শারীরিক বিকাশ নিয়ে যতটা চিন্তিত, পড়ালেখা নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন তার ন্যুনতম উদ্বিগ্নতা নৈতিক শিক্ষার প্রতি দেয়া হয় না। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত জাতি সৃষ্টি করা। যে জাতির প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সর্বোপরি মানবপ্রেম বিরাজ করবে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যে বসবাস করার প্রধান শর্ত হচ্ছে একে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা করা এবং একে অপরকে এই অধিকার ভোগ করতে সাহায্য করা। তাইতো সমাজের চাহিদা পুরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষার চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া উচিত। এতে করে একজন শিক্ষার্থীর শৈশব থেকেই আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষা শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্য হলে আর যাই হোক, তা দিয়ে দেশের উন্নতি আশা করা যায় না। এ শিক্ষা যদি শুধু অর্থ রোজগারের মাধ্যম হয়, স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কল্যাণের জন্য হয়, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর না হয়, যদি মানুষকে আলোকিত না করে তাহলে সেটা কিসের শিক্ষা?

যে শিক্ষা মানুষের বুদ্ধির অর্গল খুলে দেয় না বা হৃদয় প্রসারিত করে না সেটা শিক্ষা নয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়লেও সে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। জগৎকে বোঝা ও জানাই হলো শিক্ষা। আমরা সেই শিক্ষা চাই যা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। একজন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষই জনগণের কল্যাণে এগিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করে না। অথচ একজন মূল্যবোধহীন মানুষ চোখের সমানে সব ঘটে যাওয়া অন্যায় অবিচারগুলো অবনত মস্তকে মেনে নেয়। যে জাতি উন্নয়নের পথে হাঁটতে চায়, সেই জাতিকে অবশ্যই মূল্যবোধের শিক্ষায় সমৃদ্ধ হতে হবে।

ভাষাগত বিকাশঃ

বয়সের সাথে সাথে শিশুর ভাষার ধারাবাহিক পর্যায় রয়েছে। শিশুর ভাষা কিভাবে এবং কতটুকু বিকশিত হবে তা নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির উপর।

বর্তমানে শতকরা ৭০ টা বাচ্চা বয়সের তুলনায় কম কথা বলে, বা বলে না অথবা অস্পষ্ট কথা বলে। কথা দেরিতে বলার এই বিষয়টাকে বলা হয় স্পীচ ডিলে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো বাচ্চার সাথে কম কথা বলা এবং মোবাইল ফোনে বাচ্চাকে অভ্যস্ত করানো। আমার ১২ বছরের পেশাগত জীবনে আমি যত কম কথা বলা বা দেরিতে কথা বলা বাচ্চা দেখেছি তার বেশিরভাগই হিস্ট্রি নিয়ে জানা গেলো অতিরিক্ত পরিমাণে মোবাইল ফোন বা টিভি দেখাতে অভ্যস্ত ছিলো। আমার পর্যবেক্ষণে দেরিতে কথা বলার কিছু কারণ:

১. শিশুর সাথে কম কথা বললে
২. শিশুকে কম সময় দিলে
৩. শিশুর চোখে চোখ রেখে না হাসলে
৪. শিশুকে ডিজিটাল ডিভাইসের সংস্পর্শে অতিরক্ত সময় রাখলে
৫. মা অথবা কেয়ার গিভার যদি নিজেই কম কথা বলে
৬. বংশের কেউ যদি কম কথা বলে থাকে

কথা বলার যেসব সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসেঃ

১. বয়সের তুলনায় কম কথা বলে
২. কথা গুছিয়ে বলতে পারে না
৩. অস্পষ্ট কথা বলে
৪. কথা বলতে তোতলায়
৫. উচ্চারণে সমস্যা
৬. বিশেষ বিশেষ বর্ণ উচ্চারণ করতে সমস্যা
৭. কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়
৮. জোরে কথা বলতে পারে না ইত্যাদি

বাচ্চার সাথে কথা কিভাবে বলতে হবেঃ

জন্মের পরই শিশুর সাথে মা চোখে চোখ রেখে কথা বলবে, হাসবে। তার প্রত্যেকটা কাজ কথা বলে বলে করাবে। যেমনঃ তোমাকে এখন খাওয়াবো, তোমাকে গোসল করাবো, তোমাকে ঘুম পাড়াবো, তোমাকে কাপড় পড়াবো ইত্যাদি। শিশু আর একটু বড় হলে ছোট ছোট বাক্যে কথা বলতে হবে। যেমনঃ এই যে বল, এই যে গাড়ি, এই যে পুতুল, চলো বাইরে যাই, চলো খেলি। যাতে করে শিশু এইসব কথা শুনবে, বুঝতে পারবে এবং ধীরে ধীরে বয়সের পর্যায় অনুযায়ী বলতেও পারবে। আমরা অনেকেই একটা জায়গায় ভুল করি, আমরা মনে করি ছোট শিশু কিইবা বোঝে। তার সাথে কথা বলার কি আছে? তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ছোট শিশু অনেক কিছুই বোঝে, সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেসব সাউন্ড বা শব্দ বেশি বেশি শুনে তার জন্মের পর সেই শব্দ শুনলে সে বুঝতে পারে। তাই তাদের সাথে ছোট অবস্থায় যদি বেশি বেশি কথা বলা যায় তবে তা পরবর্তীতে তার স্পীচ ডেভেলপম্যান্টে দারুন প্রভাব ফেলবে।

মোবাইল ফোন, টেলিভিশন বা যে কোনো ডিজিটাল ডিভাইসই হোক না কেনো তা হচ্ছে একমুখী ওয়ান ওয়ে ইন্টারেকশন। যার ফলে সেই ডিভাইসটা নিজেই কথা বলে বা রেসপন্স করে, শিশুটা ডিভাইসের সাথে কোনো কথা বলতে পারে না। অথবা শিশুর যে কোনো শব্দের সাথেও

ডিভাইস প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে না। ফলে শিশু নতুন কিছু শিখে না বা দেরিতে শিখে। পরিবারের সকলে যদি শিশুর সাথে হেসে হেসে কথা বলে, তার প্রত্যেকটা কর্মকান্ডে রেসপন্স করে, তার চাহিদাগুলো বোঝার চেষ্টা করে এবং সেই মোতাবেক তা পূরণ করে তবে শিশুর স্পীচ দ্রুত ডেভেলপ করে।

শিশুর সাথে সবসময় স্পষ্ট অক্ষরে এবং শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হয়। আঞ্চলিকতা পরিহার করে কথা বলতে হয়। কারণ শিশু যা শুনবে তাই বলতে শিখবে। আমি এইখানে যার যার অঞ্চলের ভাষাকে খাটো করছি না। নিজের গ্রামের ভাষা অবশ্যই শিখবে তবে তা নির্দিষ্ট বয়সের পর। যদি শুরু থেকেই তার সাথে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা হয় তবে তার প্রথম কথাগুলোই হবে আঞ্চলিকতাপূর্ণ যা তার ভাষার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা অনেক ব্যক্তিকে দেখি যারা তাদের পেশাগত জীবনেও আঞ্চলিকতা পরিহার করতে পারে নি। এই বিষয় তার ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। তাই শিশুর সাথে শুদ্ধ ভাষায় এবং স্পষ্ট অক্ষরে কথা বলা উচিত।

শিশুর খেলাধুলা

গাছের বেড়ে উঠা, পাখির আকাশে উড়ে চলা, নদীর কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলা যেমন প্রাকৃতিক এবং সহজাত তেমনি শিশুর খেলাধুলা, আনন্দ-বিনোদনও প্রাকৃতিক এবং সহজাত। প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যদি সেই নিজস্ব গতি বা বৈশিষ্ট্যকে রূদ্ধ করে রাখা হয় তবে সৃষ্টির গতিশীলতা এবং বিকাশ ব্যহত হয়। শিশুদের সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা খেলাধুলা করবে, হাসবে, দৌড়াবে, আবিষ্কার করবে। শিশুর এই সহজাত প্রবৃত্তিকে যদি বাধাপ্রদান করা হয় বা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে না দেয়া হয় তবে শিশুর সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যহত হবে। বর্তমানে আমাদের যান্ত্রিক জীবনে জীবিকার তাগিদে বেশিরভাগ পরিবারকে শহুরে জীবন বেছে নিতে হয়েছে। আকাশচুম্বী উঁচু অট্টালিকায় তাদের বসবাস। জানালা দিয়ে অথাব বারান্দায় বসে তাদের আকাশ দেখতে হয়, যার কারণে তাদের হৃদয় আকাশের মতো নীল, আর উদার হতে পারে না। বিনোদনের জন্য টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ভিডিও গেইমসের মতো ডিভাইসের শরণাপন্ন হতে হয় ফলে তাদের শারিরীক, মানসিক প্রাণচঞ্চলতা থাকে না, সজীবতা থাকে না। নদী তার গতি হারালে যেমন পচা পানিতে রূপান্তরিত

হয় তেমনি শিশুর প্রকৃতির মাঝে, প্রকৃতির সাথে খেলাধুলার এই পরিবেশ দিতে না পারলে সে ঘরের কোণে শো-কেসে সাজিয়ে রাখার মতো শো-পিসে পরিণত হয়।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ পিয়াজে মতানুসারে খেলার মাধ্যমে কচি শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগীয় ও ভাষাগত বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। খেলার মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা অর্জিত হয়। আর খেলার হাত ধরেই তার জ্ঞান, আবেগ, সামাজিকতা, সৃজনশীলতা, স্বপ্নচারিতা, শারীরিক দক্ষতা বিকশিত হয়। খেলার মাধ্যমে শিশু যে আনন্দ পায় বা কোনো কিছু সর্ম্পকে জানার কৌতুহল জন্মায় তা থেকে বারবার তার মস্তিস্কে সিগনাল আদান-প্রদান হয়। বারবার সিগনাল আদান-প্রদান হলে মস্তিস্কের সংযোগগুলো বিকশিত হয়। এই সংযোগ যত বেশি হবে ততই মস্তিস্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ খেলাধুলা মস্তিস্ক বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে কাজ করে। শিশু মনোবিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট ব্রাউন বলেছেন, খেলাধুলাই হলো বিশ্বসভ্যতার বিরাজমান সকল সাহিত্য, সংস্কৃতি, বই, চলচিত্র, ফ্যাশন, আনন্দ ক্রীড়াজগতে অসাধারণ নৈপূণ্য ও বিস্ময় জাগানো কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। অর্থাৎ আমরা যাকে সভ্যতা বলি তার ভিত্তিই হলো শৈশবকালীন খেলাধুলা।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের (নভেম্বর ২৯, ১৯৮৯) শিশু অধিকারের ৩১ অনুচ্ছেদে শিশুর বিশ্রাম নেয়ার খেলাধুলা করার বয়স উপযোগী বিনোদোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিশুর এই অধিকার যাতে সংরক্ষিত হয় তা দেখার দায়িত্ব দেশ, জাতি ও সমাজের।

একটি সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ, সমাজ ও পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে শিশুকে অবারিত খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যত।

ব্যতিক্রমধর্মী শিশু

ব্যতিক্রমধর্মী শব্দটি ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করে। যেসব শিশুর আচরণ স্বাভাবিক মানের নয় অর্থাৎ স্বাভাবিক গড় মানের চেয়ে এতটাই উপরে বা নিচে যে, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেসব শিশুদেরকে বোঝাতে ব্যতিক্রমধর্মী (এক্সেপশনাল) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই ব্যতিক্রমধর্মী শিশু বলতে বুদ্ধির দিক থেকে মেধাবী (গিফটেড) এবং গুরুতর প্রতিবন্ধী (রিটারটেড) শিশু উভয়কেই বোঝানো হয়।

প্রতিবন্ধী বা বাধাগ্রস্ত অথবা হ্যান্ডিক্যাপ শব্দটি দ্বারা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা অথবা আচরণ বৈশিষ্ট্যের জন্য একজন ব্যক্তি অন্যান্যদের থেকে আলাদা বিবেচিত হওয়ায় যেসব সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয় হয় তাকে বোঝানো হয়। বাধাগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী শব্দটি ব্যতিক্রমধর্মীর তুলনায় অধিকতর সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত এবং মেধাবী শিশুর আওতাভূক্ত নয়।

অক্ষমতা হলো এমন একটি শারীরিক সমস্যা যা অন্য অধিকাংশ লোকেরা যে কাজ করতে সক্ষম যেসব কাজ করার ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে। এটি মূলত শারীরিক অবক্ষয় বা ক্ষয়ের মতো অবস্থা। যতক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক সমস্যাটি শিক্ষাগত, সামাজিক, বৃত্তিমূলক বা অন্য কোনো সংকট সৃষ্টি না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন অক্ষম ব্যক্তি প্রতিবন্ধী নয়।

ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী
২. শিখন প্রতিবন্ধী
৩. আচরণের অস্বাভাবিকতা
৪. ভাব বিনিময় বা যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা
৫. শ্রবণ শক্তির অবক্ষয়
৬. দৃষ্টি শক্তির অবক্ষয়
৭. শারীরিক বা অন্যান্য স্বাস্থ্যগত ত্রুটি বা অবক্ষয়
৮. গুরুতর বাধাগ্রস্ত অবস্থা
৯. মেধাবী বা বিশেষ গুণসম্পন্ন

বিশেষ শিশুদের লালন পালনঃ

মানসিক সমস্যাগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রথমে তার অভিভাবকদের মেনে নিতে হবে। অধিকাংশ শিশুই মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ার বিষয়টি একেবারেই মেনে নিতে চায় না বা মেনে নিতে পারে না। এমনকি যখন তারা সন্তানের আচরণে অস্বাভাবিক লক্ষণ খুঁজে পান তখনও সন্তানের স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার অপেক্ষা করেন। সন্তানের

অস্বাভাবিক বিষয়টি বুঝতে পারার সাথে সাথে অভিভাবকের উচিত শিশুর যথাসম্ভব স্বাভাবিকত্ব আনার ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেয়া, যাতে করে বাড়িতেই শিশুকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

১. প্রথমেই বয়স এবং ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো নিজেদেরকে করতে শেখানো। যেমন: দাঁত ব্রাশ করা, টয়লেট ট্রেনিং, কাপড় পরা, নিজেদের সবকিছু পরিস্কার করা এবং গুছিয়ে রাখা শেখানো।

২. সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।

৩. তাদেরকে শারীরিক বা মানসিক কোনো ধরণের আঘাত করা থেকে বিরত থাকা।

৪. সর্বদা শিশুদের এইসব ইতিবাচক কাজকে প্রশংসা করা।

৫. শিশুর দুর্বলতা বা নেতিবাচক দিকগুলো তার সামনে বলা থেকে বিরত থাকা।

৬. ভাষা বিকাশে পিছিয়ে পড়া শিশুদের সাথে বেশি বেশি করে কথা বলা, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা।

৭. এই ধরণের শিশুদেরকে বেশি সময় একা থাকতে দেয়া বা একা একা খেলতে দেয়া যাবে না।

৮. শিশু কোন কাজ করতে আগ্রহী তা জেনে সেই কাজ করতে তাকে বেশি বেশি উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

৯. সৃজনশীল কাজে শিশুর আগ্রহ বৃদ্ধি করা।

১০. সাথে যে কোনো বস্তু, খাবার, খেলনা বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করে ব্যবহার করতে শেখাতে হবে।

ভুল চিকিৎসায় সময়ক্ষেপণঃ

আরেকটা দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমাদের দেশের কিছু শিশু বিশেষজ্ঞরা এই ধরণের মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বা কথা বলা, বসা, হাঁটাচলায় পিছিয়ে পড়া শিশুদেরকে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে না পাঠিয়ে নিজেরাই চিকিৎসা করে থাকেন। ফলে শিশুর বাবা-মা প্রচুর ভোগান্তির শিকার হন। অনেক হয়রানির পর তারা যদি জানতে পারেন যে,

এই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ আছে তখন তারা তাদের কাছে যায়, ততদিনে হয়তো বা তার সন্তানের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়।

শিশু বিকাশের কিছু মাইলফলক আছে। যা দেখে আমরা বুঝতে পারি তার সঠিক বিকাশ হচ্ছে কিনা। আমাদের দেশের অধিকাংশ বাবা-মা এই বিষয়গুলোতে অজ্ঞ। ফলে তারা কোনো ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। যখন শিশুর সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে তখন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। আজও খিঁচুনী রোগকে গ্রামাঞ্চলে জ্বিনের আসর বা বাতাস লেগেছে বলে ধারণা করা হয়। তাই তারা কবিরাজের কাছে যায়। কবিরাজের চিকিৎসা নিতে নিতে দেখা যায় বাচ্চার সমস্যা গুরুতর অবস্থায় পরিণত হয়। এছাড়াও আরও কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন: সঠিক সময়ে বসতে বা হাঁটতে না পারা, কথা বলতে না পারা, তোতলামো, আঙ্গুল চোষা এই বিষয়গুলোকে তেমন একটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয় না; বলা হয় বড় হলে সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। অভিভাবকদের এই অসচেতনতার দরুণ একজন ব্যক্তিকে তার শৈশব থেকে আজীবন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বিশেষ করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একটি পরিবারে যখন একটি অটিজম শিশুর জন্ম হয় তখন পুরো পরিবারই বিপাকে পড়তে হয়। সুন্দর পৃথিবীতে হাসি আর আনন্দময় জীবন, সবার অধিকার। কিন্তু 'অটিজম' একটি শব্দ যা একটি শিশুকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, সারা জীবনের জন্য। যেন একটি নিহারিকা পৃথিবীতে এসেও আবার তা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।

যে সব লক্ষণ দেখলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরিঃ

শিশুর বিকাশ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য কিছু চিহ্ন বা লক্ষণের রয়েছে। যখন আমরা দেখতে পাব যে, সঠিক সময়ে যা যা করার কথা শিশু তা করছে না তখনই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত। যেমন:

(ক) ৩-৪ মাস বয়সে যদি শিশু মায়ের মুখের দিকে না তাকায়, কারও সাথে না হাসে,

(খ) ৬-৭ মাস বয়সে যদি শিশু বু-বু-বু, দা-দা,দা, এইসব শব্দ গুলো না করে, যদি বসতে না পারে,

(গ) ৯-১১ মাস বয়সে নিজের নামের সাথে রেসপন্স না করে অর্থাৎ না তাকায়,

(ঘ) ১২-১৩ মাসে আঙ্গুল বা চোখ দিয়ে কোনো কিছু নির্দেশ করতে না পারে, যদি হাটঁতে না পারে।

১. আমরা লক্ষ রাখব শিশুর বয়স অনুযায়ী শারীরিক বিকাশগুলো ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা? যেমন:

ক. ৩/৪ মাস বয়সে একটি শিশুর ঘাড় শক্ত হবে

খ. ৬/৭ মাস বয়সে সে বসতে পারবে,

গ. ৯ মাস বয়সে হামাগুড়ি দিতে পারবে

ঘ. ১৩/১৪ মাসে হাঁটতে পারবে।

এই সময়ের মদে যদি বিকাশগুলো না হয় তবে বুঝতে হবে বাচ্চা বিকাশের দিক থেকে পিছিয়ে আছে।

একইভাবে শিশুর ভাষাগত এবং মানসিক বিকাশেরও কিছু লক্ষণ রয়েছে। যেমন আমাদেরকে দেখতে হবে-

২. (ক) শিশু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে কি না?

(খ) ইশারা করতে পারে কি না?

(গ) নাম ডাকলে তাকায় কি না?

(ঘ) অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেয় কি না?

(ঙ) সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে কি না? ইত্যাদি।

এছাড়াও যেসব বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে সেগুলো হলো:

১. তোতলামো

২. অস্পষ্ট উচ্চারণ

৩. নির্দিষ্ট বর্ণ উচ্চারণে সমস্যা

৪. অতিরিক্ত চঞ্চল এবং মনোযোগের অভাব

৫. বিশেষ শিক্ষণের বিকৃতি

৬. বিছানা ভিজানো

৭. আঙ্গুল চোষা

৮. মিথ্যা বলা, চুরি করা

৯. বিলম্বিত বুদ্ধি বিকাশ

১০. নিজের মতো থাকা বা একা একা থাকা

১১. অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি করা।

১২. অনৈতিক কার্যকলাপে অভ্যস্ত

১৩. সমবয়সীদের বন্ধুত্ব স্থাপনে ব্যর্থতা

অটিজম

আমাদের সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি পাওয়া যাবে যারা আর দশ জন মানুষ থেকে ভিন্ন। তারা বহুলাংশেই নিঃসঙ্গ মানুষ। তারা তাদের চারপাশের সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এরা অন্যের সাথে কখনই কোনো সামাজিক বা আবেগিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। এমনকি তার পরিবারের সদস্যদের সাথেও দু'একটি বিষয় ছাড়া কোনো আন্তঃযোগাযোগ বা মনোভাবের আদান প্রদানে ব্যর্থতা প্রকাশ করে। এরা অন্য মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদাকে বুঝতে পারে না।

লিও ক্যানার প্রথম অটিজম বিষয়টা আবিষ্কার করেন। অটিজমের কারণ সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা যায় নি। বর্তমানে বলা হয় মস্তিস্কের গঠনগত ত্রুটির কারণে এই সমস্যা দেখা দেয়। জন্মের পর থেকেই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে এমন শিশুর মধ্যেও পরবর্তীতে অটিজমের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যদি দেখা যায়, খুব মিশুক এবং আধো আধো শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছে এমন কোনো শিশু হঠাৎ করে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে, কারো সাথে মিশছে না, খুব নির্লিপ্ত এবং উদাসীন আচরণ করছে এবং সারাক্ষণ নিজের মতো মগ্ন হয়ে থাকছে তখন ধরে নিতে হবে শিশুটির কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। শিশুর যত কম বয়সে এই রোগ চিহ্নিত করা যাবে অটিজমের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ততই সুবিধা হবে। তাই অটিজমের কোন সর্তকতামূলক লক্ষণ দেখা গেলে যত দ্রুত সম্ভব পেশাদার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে শিশুকে পরীক্ষা করানো উচিত।

সাাধারণত যেসব লক্ষণ দেখে সাধারণ শিশুদের থেকে অটিস্টিক শিশুদের পৃথক করতে পারা যায় তা হলো:

১. এই সকল শিশুরা কারও সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না।

২. তাদের ভাষার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, অনেক দেরিতে হয়। একই কথা বার বার বলতে থাকে (রিপিটিটিভ)। তবে সাধারণত বেশিরভাগক্ষেত্রেই দেখা যায় এরা কথা বলে না।

৩. তাদের কাজকর্ম, সক্রিয়তা যথেষ্ট সীমিত।

অটিজম ও শিশু মনোরোগ বিষয়ক সেমিনার
কাউন্সেলিং করবেন-
প্রখ্যাত শিশু মনোরোগ বিজ্ঞানী, স্পিচ থেরাপিষ্ট
মনোবিজ্ঞানী সুলতানা রাজিয়া
স্থান/ চেম্বার
শ্রবণ
ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রাঃ লিঃ
ফেনী ব্রাঞ্চ

৪. অন্যের সাথে দৃষ্টি সংযোগ এড়িয়ে চলে।

৫. অন্যের প্রশ্নে বা ডাকে সাড়া দেয় না। নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেয় না, মনে হবে যেন শুনতে পাচ্ছে না।

৬. এমন আচরণ করে মনে হয় যেন কারও আসা-যাওয়া একদমই খেয়াল করছে না।

৭. কোন কারণ ছাড়াই অন্যকে আঘাত করে, আহত করে।

৮. নিজেকে গুটিয়ে রাখে। পরিচিত মুখ দেখলেও হাসে না।

৯. কোন একটি বিশেষ বিষয়, কাজ বা বস্তুর প্রতি অত্যধিক মনোযোগী থাকে।

১০. অদ্ভুত দেহভঙ্গি করে।

১১. খেলনা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোঁকে, এমনকি অন্যের কাপড়, চুল এসবেরও গন্ধ শোঁকে।

১২. প্রচন্ড ব্যথা পেলে বা কোথাও পুড়ে গেলেও তেমন একটা ব্যথা প্রকাশ করে না।

১৩. ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। যেমন: আলো, শব্দ, স্পর্শ, যন্ত্রনা প্রভৃতির সাথে অতিরিক্ত, দ্রুত বা স্বাভাবিকের চাইতে কম সাড়া দেয়।

১৪. অন্যের ভালোবাসা, সাহচর্য, সহমর্মীতা এসবের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ থাকে না।

১৫. বয়স উপযোগী খেলা খেলতে পারে না। বয়স উপযোগী আচরণ দেখাতে অপারগ থাকে।

১৬. একই ধরণের কাজ বার বার করে।

১৭. অধিকাংশ অটিস্টিক শিশু স্বল্প মাত্রায় বা মধ্যম মাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।

১৮. এদের সামনে হাসি, কান্না, আবেগ, অনুভূতির কোন মূল্য নেই।

ডিজিটাল ডিভাইস মহামারিঃ

মা এসে বললো, "আপা! আমার বাচ্চাটা খুব অস্থির

১. আমার বাচ্চা মোবাইল ফোন না দেখলে খেতে চায় না,

২. আমার বাচ্চা সারাদিনা মোবাইল ফোনে গেমস খেলে,

৩. আমার বাচ্চার পড়াশোনায় কোনো মনোযোগ নেই,

৪. আমার বাচ্চার মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে,

৫. আমার বাচ্চার রাতে ঘুম হয় না,

৬. আমার বাচ্চাটাকে যা চায় তাই এনে দিতে হয়,

৭. আমার বাচ্চা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, মাথাব্যাথা করে, চোখ ব্যথা করে,

ইদানিং এইরকম হাজারো সমস্যা নিয়ে অভিভাবকরা বিশেষজ্ঞদের কাছে যান। অথচ তারা জানেনই না এই সমস্যার শুরু কোথায়? অভিভবকরা এটাও জানে না যে, তারা নিজেই এইসব সমস্যার উৎপত্তির পেছনে ৯০% দায়ী। শুধু বাচ্চার প্রতি তাদের অনেক অনেক অভিযোগ। কথা হলো, একটা ছোট শিশু জন্মের পর থেকে মোবাইল ফোন, টিভি, যে কোনো ধরনের ডিভাইসের সাথে পরিচিত থাকে না বা তারা বুঝেও না এগুলো দিয়ে কি করতে হয়? আমরা অর্থাৎ অভিভাবকগণ আদর করে ছোট্ট সোনামণিকে মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখতে দেই, কার্টুন দেখাই, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে সেলফি তুলি, টিকটক করি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু সময় পর বাচ্চাটা যখন এইসব ডিভাইসের সাথে ভালোভাবেই পরিচিত হয় তখন এইসব ডিভাইসের প্রতি তাদের একটা প্রচন্ড আগ্রহ জন্মায় যা পরবর্তীতে ভয়ংকর আসক্তিতে রূপ নেয়। বর্তমানে ডিজিটাল ডিভাইস এডিকশন না বলে ডিজিটাল ডিভাইস মহামারি বলা উচিত। শিশুর পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যাওয়া বা অতিরিক্ত অস্থিরতার কারণ হলো এ সমস্ত ডিভাইসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি (স্ক্রীন এডিকশন)

বাবা-মা দুইজনই চাকুরীর প্রয়োজনে ঘরের বাইরে থাকেন। ঘরে তাকে গৃহকর্মী বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে দাদি-নানী। ঢাকা শহরের শিশুদের জন্য তেমন কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থাও নেই। বাসাগুলো তাদের জন্য পাখির খাঁচার মতো। প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বাইরে বের করা হয়, প্রয়োজন শেষে আবারও খাঁচায় বন্দি। যার ফলে শিশুরা তাদের অবসর সময়গুলো মোবাইল ফোনে গেইমস খেলে, ল্যাপটপ চালিয়ে, ইন্টারনেট ব্রাউজ করে অথবা টিভিতে কার্টুন দেখে ব্যয় করছে। তাদের দূরন্ত শৈশব এইভাবেই চারদেয়ালের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে এ বাচ্চাগুলো সমবয়সী কারও সাথে মিশতে পারে না, সামাজিকতা বোঝে না, খেলাধুলা সর্ম্পকে উদাসীন থাকে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। এছাড়াও অনেকধরনের মানসিক সমস্যায় ভোগে।

মার্কিন জার্নাল 'পেডিয়াট্রিক্স' এ প্রকাশিত একটি জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিশু প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখে বা কম্পিউটার গেইমস খেলার জন্য স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে তারা অন্য শিশুদের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বেশি সমস্যায় ভোগে। তারা বেশি আবেগপ্রবণ হয়, সবকিছুই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া করে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজুড়ে যন্ত্রপাতির প্রতি সবারই একটা বিশেষ আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। যাকে গ্যাজেট প্রেম বললে হয়তো ভুল

হবে না। স্মার্টফোন, আইফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ ডিজিটাল ক্যামেরার প্রতি বড়দেরকে দেখে দেখে শিশুদেরও আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে। কারো কারো কাছে এইসব ব্যবহার করতে পারাও স্মার্টনেসের পরিচয় বহন করে। শিশুরা বড়দের কাছ থেকে এইসব মানসিকতা গ্রহণ করছে। ছেলেমেয়েরা মাঠে গিয়ে খেলাধুলার পরিবর্তে কম্পিউটার মোবাইল ফোনের ছোট স্ক্রিনেই সময় কাটাচ্ছে বেশি। পাশাপাশি বসে থাকা দুজন মানুষ একে অপরের সাথে কথা না বলে দূরবর্তী কারও সাথেই ম্যাসেঞ্জারে কথা বলছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, এতে করে কিশোর-কিশোরীরা সাময়িক স্বস্তি খুঁজে পেলেও এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সম্প্রতি ব্রিটেনের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত জরিপের ফলাফল 'পেডিয়াট্রিঙ জার্নালে প্রকাশিত হয়। সেখানে ১০-১১ বছর বয়সী ১০১৩ জনা শিশুর উপর জরিপটি করা হয়। এদের কেউ কেউ দৈনিক ৫ ঘন্টা পর্যন্ত টিভি দেখে, অথবা কম্পিউটারে গেইমস খেলে। আবার কেউ কেউ এক মুহূর্তও টিভিও দেখে না আবার কম্পিউটারে গেইমসও খেলে না। উভয় দলকে ২৫ টি করে প্রশ্ন করা হয়। দেখা যায়, যেসব শিশু দুই ঘন্টা বা তার বেশি সময় টিভি দেখে বা কম্পিউটারে খেলাধুলা করে তাদের চেয়ে যারা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে না তারা বেশি নম্বর পেয়েছে। জরিপে আরও দেখা যায়, যেসব শিশু শারীরিকভাবে সবল অথচ স্ক্রীনের সামনে দুইঘন্টা বা তার বেশি সময় অতিবাহিত করে তারাও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ স্ক্রিনের সামনে বেশি সময় অতিবাহিত করাই হলো প্রধান সমস্যা।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. মোহিত কামাল বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা অসমাজিক হয়ে পড়ছে মূলত মা-বাবার কারণে। মা-বাবাকেই সবচেয়ে বেশি সময় দিতে হবে। খেলার সুযোগ না থাকলে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে আত্মীয় বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। এটা করলে শিশুরা সামাজিকতা শিখবে। সেখানে অন্য শিশুদের সাথে মিশে যেমন তাদের সহ্য ক্ষমতা বাড়বে তেমনি বাবা-মায়ের অন্য বন্ধুদের সাথে ভদ্র ব্যবহার দেখেও তারা শিখবে।

মনোবিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন, শিশুকে প্রতি মুহূর্তে দিতে হবে মধুর অভিজ্ঞতা, সুন্দর সাজানো সময়। শিশুকে প্রচুর খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে। খেলার মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ে। শিশুদের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে বড়দের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বড়রা যদি শিশুদের প্রতি দয়া,

সুবিবেচনা ও ভালোবাসা দেখায় তবে শিশুরাও এসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। এতে করে তার মানসিকতা ইতিবাচক দিকে প্রবাহিত হবে। চিকিৎসকদের মতে, এটি এক ধরণের ইলেক্ট্রনিক কোকেন। অন্যদিকে আমেরিকান নেভি এবং এবং এডিকশন রিসার্চ ফর দ্যা পেন্টাগনের প্রধান ড. অ্যান্ড্রু ডোয়ানের মতে এই প্রযুক্তিগুলো এক ধরনের ডিজিটাল ফারমাকিয়া বা মাদকের অপর নাম। কথাগুলো কিন্তু একেবারেই মিথ্যা নয়। গেমস খেলায় নেশাগ্রস্ত শিশুর হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিন। দেখুন কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে সে? অনেক সময় গেইমসের জগতটাই শিশুর কাছে সবকিছু হয়ে পড়ে। ফলে বাস্তবের উপর থেকে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে সে। বাস্তবের সাথে গেইমসের দুনিয়ার কোনো মিল না পাওয়ায় অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে। উদ্বিগ্নতা আর উগ্র আচরণ প্রকাশ করে। চিকিৎসকের মতে, প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ বেশি কাজের। তাই আপনার সন্তানকে এই গেইমসের পৃথিবী থেকে দূরে রাখুন। দরকার পড়লে টেলিভিশনটাও বন্ধ করে দিন। আমরা এখন যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করি সেই গুগল, অ্যামাজন বা উইকিপিডিয়ার আবিষ্কারকরা তাদের সন্তানদেরকে এই প্রযুক্তির কাছে থেকে দূরে রাখেন। এমনকি তারা নিজেরাও অনেকটাই দূরে থাকেন এগুলো থেকে। সিলিকন ভ্যালির বেশিরভাগ মানুষই তাদের সন্তানদেরকে প্রযুক্তিগত কোনো প্রভাব নেই এমন বিদ্যালয়ে ভর্তি করান।

প্রথমত, অন্যসব নেশার প্রতিকারের সময় যেমন সেই নেশাজাতীয় দ্রব্যের কাছ থেকে আসক্তকে দূরে রাখা হয়, তেমনি ডিজিটাল এই নেশার ক্ষেত্রেও নেশার উদ্রেগকারী এই বিষয়গুলোকে আসক্তের কাছ থেকে দূরে রাখুন। দ্বিতীয়ত, অনেকসময় শিশুরা একলা থাকতে থাকতে মানসিক অবসাদে ভোগে আর আশ্রয় নেয় প্রযুক্তির। তাই তাকে সময় দিন। খাবার টেবিলে চেষ্টা করুন কেউ যেনো হাতে প্রযুক্তিগত কোনো পণ্য নিয়ে না বসে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটান, কথা বলুন। মানসিকভাবে তাদেরকে আনন্দে রাখুন। তৃতীয়ত, শিশুর সাথে সরাসরি কথা বলুন। কেনো তাকে গেইমস খেলতে দেয়া হচ্ছে না, যে কোনো ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তাকে দূরে রাখা হচ্ছে এই বিষয়গুলো তাকে সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন। তাহলে সে আপনাকে ভুল বুঝবে না বরং সহযোগিতা করবে। চতুর্থত, শিশুকে বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। তাকে গল্পের বই পড়তে দিন, সবুজ মাঠে খোলা আকাশের নিচে দৌড়াতে দিন। তাকে সৃজনশীল কাজ

করতে উৎসাহীত করুন। এতে করে তার কল্পনাশক্তি বাড়বে। তখন সে গেইমস বা প্রযুক্তিগত পণ্যের আর অভাববোধ করবে না।

একজন শিশু তাই করে যেটা সে দেখে। তাই আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময় কাটাবেন আর শিশুকে একই কাজ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করবেন সেটা শিশু কেনো মানবে? তাই নিজেকেও এই নেশা থেকে বিরত রাখুন। এই প্রযুক্তির ভয়াবহ নেশা থেকে মুক্ত হয়ে শিশুকে নিয়ে একসাথে জীবন-যাপনের চেষ্টা করুন। তবে শিশুরাও এইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। এতে করে তার মানসিকতা ইতিবাচক দিকে প্রবাহিত হবে।

ডিজিটাল ডিভাইসের ক্ষতিকর কিছু দিকঃ

১. অতিরিক্ত পরিমাণে ডিভাইসে (মোবাইল ফোন) সময় দেয়ার ফলে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস।

২. পড়াশোনাসহ যে কোনো ধরনের কাজে মনোযোগের ঘাটতি

৩. নির্দিষ্ট সময়ে কথা বলতে দেরি হওয়া, কথা বলতে নানা রকম সমস্যা।

৪. মেজাজ খিটখিটে হওয়া অথবা বদরাগী হওয়া

৫. অতিরিক্ত পরিমাণে বায়না করা

৬. বয়স উপযোগী নয় এমন বিষয়ে পরিচিত হওয়া

৭. বিভিন্ন ধরনের প্রতারক চক্রের হাতে ভয়ংকর বিপদে পড়ার আশংকা

৮. মাথা ব্যথা, চোখ ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, চোখ জ্বালাপোড়া করা, চোখ দিয়ে পানি পড়া

৯. ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, স্বাস্থ্যহানী

১০. বিভিন্ন নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ এবং আসক্তি

১১. সামাজিক বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়া। ইত্যাদি

প্যারেন্টিং এর বিভিন্ন দিক

আমরা সবাই কিন্তু একই প্যারেন্টিং করি না। একই পরিবারে বাবা এবং মা ভিন্ন ভিন্ন প্যারেন্টিং এ বিশ্বাস করে। কারণ দুইজন দুটি পারিবারিক প্লাটফর্ম থেকে এসেছে। এবং তাদের শিক্ষাটাকেও তারা তাদের শিশুদের উপর চাপাতে চান। শিশু যখন বুঝতে শেখে তখন থেকেই তার ভালোবাসা আর শাসনের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। যে কোনো শিশুর জন্যই অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং অতিক্তির রক্ষণশীলতা কোনোটাই শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না। শিশুকে পরিচালনা করার এই ক্ষেত্রকে আমরা কয়েকধরণের প্যারেন্ট দেখতে পাই-

১. অথোরেটিয়ান প্যারেন্টিং
২. পারমিসিভ প্যারেন্টিং
৩. আনইনভলভড প্যারেন্টিং
৪. অথোরেটেটিভ প্যারেন্টিং

অথোরেটিয়ান প্যারেন্টিংঃ

এই ধরণের প্যারেন্টিং সাধারণত আশি/নব্বইয়ের দশকে বেশি দেখা যেতো। এইখানে বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি আশা-ভরসার পরিমাণটা তাদের দায়িত্বকর্তব্যের চাইতে বেশি থাকে। অর্থাৎ তারা যতটা না সন্তানের প্রতি দায়িত্ববান তার চাইতে বেশি তারা সন্তানের কাছে প্রত্যাশী। যেমন: এটা করা যাবে না, ওটা ধরা যাবে না, আমি যা বলেছি তাই। এই নিয়মে খুব বেশি রক্ষণশীল থাকে। এইখানে সন্তানের চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দের প্রতি কোনো মূল্য থাকে না। বাবা-মায়ের চাওয়াটাই এখানে বেশি প্রাধান্য পায়।

পারমিসিভ প্যারেন্টিংঃ

এই ধরণের বাবা-মা সন্তান চাহিবামাত্র তার সকল চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। সন্তান যখনই কিছু আবদার করে তার ভালো-মন্দ চিন্তা করে না, সে যা চাইলো সেটা তার বয়স উপযোগী কিনা তাও চিন্তা করে না। অর্থাৎ কখনোই সন্তানের কোনো আবদার বা চাহিদা অসম্পূর্ণ রাখে না। এই ধরণের প্যারেন্টিং এ এক ধরণের গা ছাড়া ভাব থাকে। কোনো ধরণের দায়িত্ববোধ থাকে না, সন্তান কখন খায়, কখন স্কুলে যায়, কার সাথে মেশে, কি খেলে, কি করে কোনো ব্যাপারেই এই ধরণের অভিভাবকদের কোনো মাথা ব্যথা থাকে না। যার ফলে এই শিশুরা বড় হয়ে সবসময় সবকিছু পেতে চায়, জীবনের না পাওয়া বলতে তাদের অভিধানে কোন শব্দ থাকে না। এবং নিজের যে কোনো চাহিদাকে পূরণ করার জন্য তারা যে কোনো সীমারেখা পার হতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ তারা ছোটবেলা থেকেই সবকিছু পেয়ে বড় হয়েছে এবং তাদের যে কোনো কাজের জন্য কখনো কাউকে জবাবদিহি করতে হয় নি। ফলে ব্যক্তিগত জীবনে, পেশাগত জীবনে, সামাজিক জীবনে তাদের সাথে অন্যদের ম্যাচিং খুব কষ্টকর হয়। এইখানে সন্তান যা বলে অভিভাবক তাই শুণে।

আনইনভলভড প্যারেন্টিংঃ

এইধরণের প্যারেন্টিং পারমিসিভ প্যারেন্টিং এর চাইতে ভয়াবহ। এ ধরণের বাবা-মা সন্তানের কোনো কিছুর ব্যাপারে জড়িত থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিভোর্স হয়ে গেলে, অথবা মা অন্য কোনো পুরুষের সাথে সংসার বাধলো, বাবা আবার অন্য কোনো নারীকে নিয়ে চলে গেলো। মাঝখান থেকে সন্তানগুলো ছাড়া গরুর মতো বিভিন্ন দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলো। তাদের আদর-ভালোবাসা, শাসন কিছুই রইলো না। এইখানে ন্যায়-অন্যায় শেখানোর কোনো মানদণ্ড শেখানোর কেউ থাকে না। আত্ম নিয়ন্ত্রণের কোনো জায়গা থাকে না, ফলে বিভিন্ন রকমের অসামাজিক, অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অথোরেটেটিভ প্যারেন্টিংঃ

সবচেয়ে উত্তম হলো এই প্যারেন্টিং। এই প্যারেন্টিং এ সর্বপ্রথম শিশুর সাথে শক্তিশালী একটা বন্ধন তৈরী করতে হয়। যাতে করে সন্তান আপনাকে বোঝে, আপনিও সন্তানকে বোঝেন। এরপর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন দুইজনের জন্য কোনটা ভালো। সন্তানের সাথে বন্ধুর মতো মিশবো। তবে সীমারেখে তার প্রত্যেকটা কাজ নিয়ে কথা বলতে পারবে। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখানো। শিশুদের মতকে সমান প্রাধান্য দিতে হবে। শুরু থেকে যখন তাকে ভালো-মন্দের বিষয়গুলো তার মনে গেঁথে দেয়া যায় তবে তারা বড় হয়ে বিশৃংখল, অসামাজিক কর্মকান্ড ইত্যাদি থেকে দূরে থাকবে।

অভিভাবকদের করণীয়

যেসব ছোটখাটো ভুল আচরণ আমরা অভিভাবকরা সাধারণত শিশুদের সাথে করি তার কিছু দিক তুলে ধরলাম। অনেক সময় আমাদের এইসব ভুলের কারণে ভবিষ্যতে শিশু নানান ধরনের জটিলতার দিকে যেতে পারে এবং ভুল পথ বেছে নিতে পারে। যা তার পরবর্তী জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে।

বাচ্চার সাথে মিথ্যা আশ্বাস

আমরা প্রায়ই ছোট বাচ্চাদের সাথে কথার ছলে ওয়াদা করি। অথচ তা পূরণ করি না। যেমন: বাইরে যাওয়ার সময় যদি বাচ্চা কান্না করে তখন বলি তোমার জন্য আসার সময় মজার জিনিস নিয়ে আসবো। এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে চলে যাই। বাচ্চাও খুশি হয়ে আমদেরকে যেতে দেয়। তারপর বাইরে যাওয়ার পর আমাদের ওয়াদার কথা ভুলে যাই। কাজ শেষে যখন বাসায় ফিরে আসি তখন আর ওয়াদা করে যাওয়া জিনিসটা আনি না। বাচ্চার মনে দারুন একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এই বিষয়টা। তাই কখনও বাচ্চাকে এই ধরণের আশ্বাস দেয়া যাবে না। যে কথাটা পূরণ করতে পারবেন কেবল সেই কথাটুকুই তাকে বলবেন। যদি কখনও কিছু বলেন, তবে অবশ্যই তা পূরণের চেষ্টা করবেন। অভিভাবকদের এই মিথ্যা আশ্বাসের কারণে একটা সময় বাচ্চাও তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া শুরু করবে। বিভিন্ন কাজ করবে বলে কথা দিলেও করবে না। তাকে যদি সেই কাজের জন্য বকা দেয়া হয় তখন সে বাবা-মাকে মনে করিয়ে দিবে যে, তারাও এইরকম আশ্বাস দিয়ে কথা রাখে নি। আদরের মধ্যেও একটা ভারসাম্য রাখতে হবে। খুব বেশি প্রশ্রয় দেওয়া অথবা একদমই বাচ্চাকে মনোযোগ না দেয়া দুটোই শিশুর জন্য

ক্ষতিকর। অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেলে সন্তানের চাহিদার কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। যখন যা খুশি তাই চাইবে এবং সবাইকে তা সরবরাহ করতে হবে। যখন সে বড় হবে তখন যা চাইবে তা কিনে না দিলে পরিবারের মধ্যে সবার সাথে ঝামেলা করবে, রাগারাগি করবে, অতিরিক্ত জেদ করবে এমনকি অনেক সময় বাবা-মায়ের গায়ে আঘাত করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

ভালোবাসার ভারসাম্য

প্রত্যেকটি জিনিসেরই ভারসাম্য থাকতে হয়। একজন মানুষ যেমন এক পায়ে হাঁটতে পারে না তেমনি একদিকে যে কোনো বিষয়ের আধিক্য সেই বিষয়টার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কিছু বাবা-মা তার সন্তানের ভালো বিকাশের জন্য সন্তান যা চায় তা করে। এই ভেবে যে, শিশুর সকল চাহিদা যখন পূরণ করবো তখন সে নিশ্চয় আমাদের কথা শুনবে। আবার কিছু বাবা-মা সন্তানের কোনো চাহিদা, চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দকে কোনো প্রকার পাত্তাই দেয় না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনই মনে করে না। বাবা-মায়ের কাছে যা ভালো মনে হয় তাই-ই করে। অতিরিক্ত প্রশ্রয় বা ভালোবাসা যেমন তাকে অবাধ্য, স্বার্থপর, লোভী, ডিমান্ডিং করে তুলবে তেমনি অতিরিক্ত রক্ষণশীল আচরণ বা কঠোর আচরণ নির্দিষ্ট সময় পর শিশুকে অত্যাচারি, বিদ্রোহী, অবাধ্য, রূঢ় করে তুলবে। তাই শিশুর লালন-পালনে অবশ্যই একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। শিশুকে অতিরিক্ত পরিমাণে যেমন প্যাম্পারিং করা যাবে না তেমনিভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে শাসনও করা যাবে না। তাইতো কথায় আছে 'Too much everything is very bad.

সুলতানা রাজিয়া

সুলতানা রাজিয়া ফেনি জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার অন্তর্গত মুহুরীগঞ্জ এর দৌলতপুর গ্রামে ১৯৮২ সালের ১৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। বড় সন্তান হিসেবে বাবা ও মায়ের পরম স্নেহে তিনি বড় হন এবং ছোটবেলাতেই বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবা তাকে চিকিৎসা ও শিক্ষকতা এই দু'টি পেশার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি ১৯৯৭ সালে এ.কে উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ থেকে স্টার মার্কসসহ ১ম বিভাগে এসএসসি ও পরবর্তীতে একই বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৯৯ সালে ১ম বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন। ২০০৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও ২০০৫ সালে সেখান থেকেই ফলিত শিশু বিকাশ ও শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রথম শ্রেণিতে অষ্টম স্থান অর্জনের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এমএসসি পাশ করার পর তিনি ঢাকার মাতুইয়াইলের শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট থেকে ফলিত শিশু বিকাশ ও শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর ইন্টার্ন করেন।

ইন্টার্ন করার সময় সেখানকার শিশুদের সাথে কাজ করতে গিয়ে এই বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষ টান অনুভব করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তখন তেমন সুযোগ না পাওয়ায় তাদের সাথে কাজ করতে ব্যর্থ হন। তিনি এমএসসি পড়ার সময় থেকেই শিক্ষকতায় যোগদান করেছিলেন। দুই বছর তিনি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, যাত্রাবাড়ি শাখায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, যাত্রাবাড়ি শাখায় এক বছর স্টুডেন্ট কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শিশুদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছাটা মনের গভীরে গেঁথে ছিল তাই এরপর যখন ফলিত শিশু বিকাশ ও শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর কাজ করার সুযোগ পান তখন তিনি এক বছর গবেষণা সহকর্মী হিসেবে শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে দায়িত্ব পালন করেন। গত আট বছর ধরে তিনি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের কাকরাইল ও মতিঝিল শাখায় শিশু মনোবিজ্ঞান বিষয়ক চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ থেকে বেসিক থেরাপিউটিক কাউন্সেলিং এবং এডভান্স কাউন্সেলিং এর উপর প্রশিক্ষণ নেন। তিনি Dhaka University Psychology Alumni Association (DUPAA) এর আজীবন সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ২০১৩ সালে শিশু মনোরোগ চিকিৎসক হিসেবে বিডি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদানকৃত নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি Bangladesh Psychology

Association (BPA) I Bangladesh Association for Child & Adolescent Mental Health (BACAMH) এর একজন সদস্য। পাশাপাশি তিনি হোমিওপ্যাথিতেও ডিএইচএমএস এর চার বছর মেয়াদী কোর্স সমাপ্ত করেন। দীর্ঘ সময়ব্যাপী কাজ করার ফলে তিনি আমাদের দেশের শিশুদের চিকিৎসার ব্যাপারে অসঙ্গতি লক্ষ করেন এবং এ থেকেই একটি ফাউন্ডেশন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নোয়াখালীতে আপন চাইল্ড কেয়ার হোম নামে তার একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমানে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত আপন শিশু বিকাশ ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ডের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সনদপ্রাপ্তি। তারিখ: ৪ ডিসেম্বর ২০১৭।

ঢাকা মিশন স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান একে মিলনের নিকট থেকে সম্মাননা পদক গ্রহণ। তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০১৭।

রেডিও ধ্বনির লাইভ অনুষ্ঠান FM Doctor *এ শিশুবিকাশ প্রসঙ্গে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান। তারিখ: ২১ ডিসেম্বর ২০১৬।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী এমপি'র নিকট থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বর্ণপদক গ্রহণ। তারিখ: ৩০ জুলাই ২০১৩।

সেরা শিশু কিশোর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কালচারাল কল্যাণ পরিষদ এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ। তারিখ: ১৮ নভেম্বর ২০২২ইং।

বইটিতে বিশেষ প্রয়োজনে যেসব শিশু ও অভিভাবকদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ- **ডা. সুলতানা রাজিয়া**।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ব্যতিক্রমধর্মী শিশু -অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপিকা ড. সুলতানা এস জামান

২. বিবাহ, গর্ভধারণ কোন নবজাতকের যত্ন -ডা. আহমেদ মর্তুজা চৌধুরী

৩. আপন ফাউন্ডেশনের ম্যাগাজিন